



কোয়ান্টাম বুলেটিন

জুন ২০১৯

বরকতায়ন কার্যক্রম

মাটির ব্যাংক পৌছে দিন
চারপাশের ৪০ ঘরে

নিয়মিত দান আনে কল্যাণ
অফুরান। প্রত্যেক ধর্মেই
মানুষকে উৎসাহিত করা
হয়েছে নিয়মিত দানে।
আর প্রতিদিন সাধ্যমতো
নিরব দানের সর্বোত্তম
একটি সুযোগ তৈরি করে
দিয়েছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

গত দুদশকেরও বেশি সময় ধরে
কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে জমাকৃত লক্ষ
মানুষের ছোট-বড় দান বদলে দিয়েছে
হাজারো দুস্থ-বঞ্চিতের জীবন।
কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও
শুভানুধ্যায়ীদের অর্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান
রাখা সম্ভব হয়েছে দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য
ও পুনর্বাসন খাতে, যা জাতীয় উন্নয়নে
সম্পন্ন করেছে উল্লেখযোগ্য গতি।
পাশাপাশি দাতারাও তাদের নিঃস্বার্থ
দানের বরকতে লাভ করেছেন নিরাময়
প্রশান্তি সাফল্য এবং কল্যাণ।

প্রিয় সুহৃদ, আপনার একটি সচেতন
প্রচেষ্টা বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে
কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের বাৎসরিক
সংগ্রহ। তাই বরকতায়ন কার্যক্রমে
অংশ নিন। চারপাশের ৪০ ঘরে পৌছে
দিন কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

সমাজের কল্যাণে আপনার এই
সাধ্যমতো শ্রম একদিকে যেমন বদলে
দেবে দুর্গত মানুষের জীবন, তেমনি
মাটির ব্যাংকে দাতারাও সংযুক্ত হবেন
একটি দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের সাথে।
আপনিও লাভ করবেন পরম স্রষ্টার
আশীর্বাদধন্য সুস্থ সুখী পরিতৃপ্ত ও
বরকতময় জীবন।

গুরুজী ও
মা-জীর
সাথে
ঈদ
মোলাকাত



ঈদের দিন, সকাল ১০টা-দুপুর ১টা
আইডিবি মিলনায়তন, কাকরাইল।
আপনি সপরিবারে ও সবান্ধব আমন্ত্রিত

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

বিরক্তি ও নেতিবাচকতা বরকত নষ্ট করে

নবীজীর (স) একটি হাদীস আছে—
'কারো সম্পর্কে তোমার মনে কোনো
বিদ্বেষ থাকবে না, কোনো অকল্যাণ
চিন্তা থাকবে না। এটাই আমার সুনুত।
যে আমার সুনুতকে ভালবাসল, সে
আমাকে ভালবাসল। যে আমাকে
ভালবাসল, জান্নাতে সে আমার সাথে
থাকবে।' আর অন্তরে বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণা
আছে কিনা তা বোঝার মানদণ্ড হলো
বিরক্তি ও নেতিবাচকতা, যা কাজের
বরকত নষ্ট করে দেয়। সাফল্য ও
সুস্থস্বাস্থ্যকে করে বাধাগ্রস্ত।

গত ৫ ও ৬ মে বান্দরবান লামার
কোয়ান্টামে একটি বিশেষ আলোচনায়
একথা বলেন গুরুজী
শহীদ আল বোখারী
মহাজাজক।

তিনি বলেন,
কাজই একজন মানুষের
সবচেয়ে বড় পরিচয়।
তাই কাজটাকে সবসময়
সামনে রাখা উচিত,
ব্যক্তি থাকবে নেপথ্যে।
ব্যক্তি যদি কাজের
সামনে চলে আসে
তাহলে কাজ ব্যক্তিকে
পেছনে ঠেলে দেবে। আর যদি
কাজটাকে সামনে রেখে নিজে পেছনে
থাকা যায়, তাহলে কাজই একসময়
ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে আসে এবং
সম্মানিত করে।

কিছু মানুষ আছে যারা সারাদিন
অনেক ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তাদের ব্যস্ততা
ফলপ্রসূ হয় না। এর মূল কারণ তাদের
ভেতরের বিরক্তি ও নেতিবাচকতা। এই
বিরক্তি কখনো নিজের ওপর, কখনো
সহকর্মী কিংবা পারিপার্শ্বিকতার ওপর,
আবার কখনো-বা দেখা যায়
অকারণেই। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির
আনুকূল্য সবসময় তিনিই পান-যিনি
সব ধরনের বিরক্তি ও নেতিবাচকতা
থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে
পেরেছেন। তার ব্যস্ততাই শেষ পর্যন্ত
ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

ইতিহাস সাক্ষী, যে-কোনো
প্রতিকূলতাকে যিনি যতটা সহজভাবে
নিতে পারেন, বিরক্ত না হয়ে বরং
সচেতনভাবে ইতিবাচক অনুরণন সৃষ্টি
করতে পারেন, তার সমস্ত প্রতিকূলতা
একসময় ঠিকই কেটে যায়। তিনি জয়ী
হন। আর সত্য হলো, আমরা কেবল
পরিশ্রমের মালিক, ফলাফলের মালিক
একমাত্র আল্লাহ।

কোয়ান্টাম পরিবারের সদ্যপ্রয়াত
দুজন অগ্রগামী সদস্য মওলানা ছায়ীদুল
হক এবং এ বি এম মাহবুবুল আলম।
একজন ছিলেন ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র,
অন্যজন ছিলেন প্রকৃতই একজন

নেপথ্যকর্মী। এ প্রসঙ্গে
গুরুজী বলেন, মানুষ
বৈচিত্র্য থাকে তার কর্মে।
তার কল্যাণচেতনায়।
তার বিশ্বাসে, ত্যাগে ও
মেহনতে। আর শুধু
স্মৃতিচারণ করলেই
কারো প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা
নিবেদন হয় না। প্রকৃত
শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয় কেবল
তখনই, যখন তার
ভালো গুণগুলো আমরা

গ্রহণ করতে পারি এবং নিজেদের
জীবনে তা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থাকি।

দোষ-গুণ মিলেই মানুষ। ফুলে মধু
যেমন আছে, তেমনি বিষও আছে।
একই ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ
করে। আর মাকড়সা সংগ্রহ করে বিষ।
এখানেই আসে সঠিক জীবনদৃষ্টির প্রশ্ন।
জীবনদৃষ্টি যদি সঠিক হয়, তাহলে
যে-কারো সং গুণ অনুসরণের মধ্য দিয়ে
আমরাও আমাদের প্রয়াত দুই
সহযোগীদার মতো সার্থক হয়ে উঠতে
পারব। জীবন থেকে সকল বিরক্তি ও
নেতিবাচকতা কাটিয়ে শুকরিয়া ও
ইতিবাচকতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে
নিজের চিহ্ন রেখে যেতে পারব।
হাজারো মানুষ আমাদের শেষ বিদায়
জানাতে তাদের হৃদয়ের অশ্রুতে ও
আন্তরিক ভালবাসায়।

মহাজাগতিক সফরে

এ বি এম মাহবুবুল
আলম



৪ মে মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেন
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা
সদস্য ও কোয়ান্টাম লামার প্রধান
সমন্বয়ক এ বি এম মাহবুবুল আলম
(ইন্সলিগ্নাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে
তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

৫ মে কোয়ান্টামমের মসজিদ
চত্বরে নামাজে জানাজা শেষে
আরোগ্যশালার কসমোড্রোমে তাকে
দাফন করা হয়।

মরহুম এ বি এম মাহবুবুল আলম
কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম ব্যাচের
গ্রাজুয়েট ও সপ্তম ব্যাচের প্রো-মাস্টার।
ফাউন্ডেশনে তার সবচেয়ে বড় ভূমিকা
ছিল সাংগঠনিক কর্মকাঠামোতে সিস্টেম
প্রণয়ন ও গতির সম্ভার।

পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন
একজন অভিজ্ঞ ব্যাংকার। ব্যাংকিং
দক্ষতার বাইরেও একাউন্টস,
এইচআর, রিসোর্স কো-অর্ডিনেশনসহ
নানা বিষয়ে তার ছিল সহজাত দক্ষতা
ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।

২০১১ সালে ব্যাংকে ইস্তফা দিয়ে
তিনি সার্বক্ষণিকভাবে কোয়ান্টামে
সম্পৃক্ত হন। ২০১১ থেকে ২০১৯, এই
আট বছরেই কোয়ান্টামে সম্পন্ন হয়
এ যাবতকালের উল্লেখযোগ্য ও
বৃহদাকার সব স্থাপনা। এ সবগুলো
কাজেরই সমন্বয়ে নেতৃত্ব দেন তিনি।

স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা ছাড়াও
ফাউন্ডেশন ও ফাউন্ডেশনের বাইরে
তিনি রেখে গেছেন অসংখ্য গুণগ্রাহী।

আমরা এ বি এম মাহবুবুল
আলমের সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা
ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং
তার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন



শিক্ষাবিদ ও ‘আলোকিত মানুষ চাই’ আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ৫ এপ্রিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনে অবস্থিত বাতিঘরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত লেখক-পাঠক আলাপনে একজন পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তারই নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

বাঁচার মতো বাঁচতে হবে

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে—‘আমি সবসময় এত আশার কথা বলি, এই আশাবাদের উৎস কী?’ আমি এখনো বেঁচে আছি, কাজ করতে পারছি—আমি বলব এটাই আমার আশাবাদের সবচেয়ে বড় উৎস। মরতে তো একদিন হবেই। কিন্তু যে কদিন আছি, বাঁচার মতো বাঁচতে হবে। মৃত্যুর আগে যেন বলতে পারি—আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা আমি করেছি। নিষ্ক্রিয় হয়ে থেমে যাই নি। ভীষ্মের মতো পেছন দিকে দৌড় দেই নি। আমি সামনে গেছি এবং এগিয়ে গেছি।

আমাদের শরীরের দিকে যদি তাকাই, কী দেখব? প্রতিটা অঙ্গ কোনদিকে যাওয়ার জন্যে তৈরি? সামনে না পেছনে? আমাদের হাত-পা সব সামনের দিকে। নাক সামনের দিকে। চোখ দেখে সামনে। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব সামনে যাওয়ার জন্যে তৈরি। আমরা জন্মেছি সামনে যাওয়ার জন্যে। জন্মেছি আশার জন্যে। জন্মেছি ইতিবাচকতা ও কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এবং তারপর একটা সম্মানজনক মৃত্যুর জন্যে।

গ্রিক দার্শনিক ডায়াজোনাস। সমসাময়িক তিন জন দার্শনিকের নাম উল্লেখ করে একজন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই দার্শনিকদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড়? ডায়াজোনাস উত্তর দিয়েছিলেন, আমাদের মৃত্যুই সেটা বলে দেবে। আমরা কে কীভাবে মৃত্যুকে উদযাপন করি, সেটা থেকেই বোঝা যাবে—আমাদের মধ্যে কে বড়।

যেমন, সফ্রেটিস। তার মৃত্যু যদি এমন মহান না হতো তাহলে আমার ধারণা—সফ্রেটিস অর্ধেক হয়ে যেতেন। অর্থাৎ যে গৌরব-গরিমায় আমরা তাকে স্মরণ করি এখনো, সেটা হতো না।

সফ্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। তবে শর্ত দেয়া হলো যে, তুমি যদি জ্ঞানচর্চা ছেড়ে দাও তাহলে আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু সফ্রেটিস বললেন, আমি জ্ঞানচর্চা ছাড়তে পারব না।

কেন তিনি জ্ঞানচর্চা ছাড়তে পারলেন না?

সফ্রেটিসের কথা হলো—একটা অর্থব্দ বা ঘোড়া, যে চলতে চায় না, এগোতে চায় না, তাকে জোরে ছুটিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা কী করি? তার গায়ে একটা ডাঁশ পোকা লাগিয়ে দেই। সেই ডাঁশ যখন কামড়াতো থাকে তখন সেই ঘোড়াতা অসহ্য যন্ত্রণায় উঠে দাঁড়ায়। ক্রমাগত ছুটতে থাকে।

সফ্রেটিস বলছেন, আমার চিন্তা আমার জ্ঞানচর্চা এখেন্দ্রপ অর্থব্দ অশ্বের গায়ে সে-রকমই একটি ডাঁশ পোকা। আমি যদি এই জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত থাকি, তাহলে এখেন্দ্র থেমে যাবে। মুখ খুঁড়ে পড়বে। তাই আমি আমার জ্ঞানচর্চা বন্ধ রাখতে পারব না। এর চেয়ে বরং মৃত্যুই ভালো।

মৃত্যুর মাত্র আধঘণ্টা বাকি। তখনো সফ্রেটিস শিষ্যদের সাথে অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একসময় জল্পনা এলো। হাতে হেমলক। সাধারণত যখন কোনো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে হেমলক তুলে দেয়া হতো, তারা সেটা নিতে চাইত না। আসন্ন যন্ত্রণাদঙ্ক মৃত্যুর কথা ভেবে ওটা ফেলে দিতে চাইত। চিৎকার করত। কিন্তু সফ্রেটিস অত্যন্ত সহজভাবে সেটা নিলেন।

জল্পনা তাকে শিখিয়ে দিল—এই হেমলক কীভাবে পান করতে হবে এবং বিধ

শরীরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে কীভাবে আস্তে আস্তে তিনি হাঁটবেন, তারপর শুয়ে পড়বেন। একসময় একটা সাদা চাদরে মাখাসহ তার পুরো শরীর ঢেকে দেয়া হবে। অতঃপর সব শেষ!

সমবেত শিষ্যদের সামনে ঠিক ওভাবেই সবকিছু করে সফ্রেটিস শুয়ে পড়লেন। সাদা চাদরে ঢেকে দেয়া হলো তাকে। হঠাৎ চাদরটা একটু সরিয়ে এক শিষ্যকে তিনি বললেন, অমুক আমার কাছে একটা মোরগের দাম পায়। একটু দিয়ে দিও।

সবাই তো আমরা মৃত্যুর কাছ থেকে পালাতে চাই। যে মানুষ ভাবে—এত পুণ্য করেছে স্বর্গলাভ নিশ্চিত, সে-ও তো মরতে চায় না। কিন্তু সেই মৃত্যুকেই কী সহজে, কী অসাধারণ ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সফ্রেটিস গ্রহণ করলেন! এটা দেখে তার শিষ্য প্লেটোর তো প্রায় পাগল হওয়ার দশা। কী করে একটা মানুষ এমন ক্রক্ষেপহীনভাবে মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে!

উচ্চায়ত দর্শনচিন্তাসহ অনেক বড় কিছু সফ্রেটিসের জীবনে ছিল। অনেক মহত্তর কথা ও কাজ আমরা তার জীবন থেকে পাই। কিন্তু আমি মনে করি, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে তার মৃত্যু। এ থেকে আমার মনে হয় যে, মৃত্যুকে আমরা কতটা মহিমাম্বিত করতে পারি, সেটাই আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হওয়া উচিত। এবং এটা সম্ভব কেবল আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে। সফ্রেটিস যে এটা পেরেছিলেন, তার কারণ, তিনি জানতেন যে, তার যা করার ছিল তা তিনি করেছেন। অর্থাৎ জীবনের সর্বোচ্চ ব্যবহার তিনি করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমরা তখন পাবনায় থাকি। এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ছিলেন ওখানে। ১৯৫২ সালে কোরিয়ায় পাট রপ্তানি করে তিনি হঠাৎ এক কোটি টাকা লাভ করে ফেললেন। আজকের হিসেবে ১৫০ কোটি তো হবেই কমপক্ষে। এটা শুনে পাড়ার লোকজন গিয়েছে তাকে অভিনন্দন জানাতে—কেয়া মুনাফা হো গ্যায়া, কিতনা খুশি কি বাত হ্যায়

ইত্যাদি ইত্যাদি। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক সব শুনছেন কিন্তু তার চেহারা কোনো ভাবান্তর নেই। ক্রমাগত পান চিবোচ্ছেন আর বলছেন, হাঁ হইতেছে, মুনাফা হইতেছে কুছু কুছু ...।

পরের বছরই ঘটলো উল্টো ব্যাপার। ব্যবসায় ৮০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়ে গেল তার। এবার সবাই গিয়ে বলছে, কিতনা লোকসান হো গ্যায়া, আফসোস কি বাত হ্যায় ...। কিন্তু দেখা গেল, তিনি ঠিক আগের মতোই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পান চিবোচ্ছেন আর বলছেন, হাঁ হইতেছে, লোকসান হইতেছে কুছু কুছু ...। মোদ্দা কথা, এসব কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না।

আমারও বক্তব্য হচ্ছে তা-ই। কোথায় উঠলাম আর কোথায় নামলাম—সেটা কোনো ঘটনা নয়। বরং আমি আমার কাজ নিয়ে সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি কিনা, সেটাই একমাত্র বিবেচ্য। উত্থান-পতন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল কথা হলো, আমার কাজটা আমি সর্বোচ্চ চেষ্টায় করছি কিনা। সেটা যদি করি তাহলে সফ্রেটিসের মতো আমরাও পারব মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে, মৃত্যুকে সত্যিকার অর্থে মহিমাম্বিত করে তুলতে।

দুধ-চায়ের আসক্তি কাটিয়ে উঠছে বাংলাদেশ

২০১৩ থেকে ২০১৮। পাঁচ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে গ্লিন টি-র ব্যবহার বেড়েছে চার গুণেরও বেশি। সাধারণ মানুষ এখন আগের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যসচেতন। তাই তাদের খাদ্যাভ্যাসে এসেছে ইতিবাচক এ পরিবর্তন। রাজধানী ঢাকার অফিস-আদালত থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের টং দোকান, সর্বত্র ছিল দুধ-চায়ের জয়জয়কার। নব্বই দশকের গোড়ায় কোয়ান্টাম দুধ-চা পানের স্বাস্থ্যগত অপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে শুরু করে। তখন বহু ঘোরাঘুরির পর কোনো চায়ের দোকানে রং-চায়ের সন্ধান পাওয়া ছিল বিরল ঘটনা।

কারণ চা বলতেই বাঙালি বুঝত ঘন দুধ, চা-পাতা আর পর্যাপ্ত চিনির মিশেলে তৈরি সুস্বাদু এক পানীয়। মজার বিষয় হলো, ৭০-৮০ বছর আগে চায়ের ব্যাপারে বাঙালির বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। দুধ-চা এদেশে কীভাবে সর্বজনীন পানীয়ে পরিণত হলো সেই ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

বাঙালির হেঁশেলে চায়ের অনুপ্রবেশ

ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন শুরু হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। তারা যখন দেখল ইউরোপের চাহিদা মেটানোর পরও বিপুল পরিমাণ চা রয়ে যাচ্ছে, তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এ অঞ্চলের মানুষকে চায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। ১৯৪০-এর দশকে ঢাকাবাসীকে চা পানে অভ্যস্ত (নাকি আসক্ত?) করার জন্যে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা অভিনব উপায় বের করে।

পুরনো ঢাকায় তারা কয়েকজন চা-ওয়ালার নিয়োগ করে। এরা প্রতিদিন রাস্তার পাশে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চা তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকত। সবাইকে বিনামূল্যে চা পরিবেশন করা হতো। নতুন এসব গ্রাহকের কাছে চা-কে সুস্বাদু পানীয় হিসেবে জনপ্রিয় করার জন্যে চা-ওয়ালারা বেশি করে দুধ ও চিনি মেশাত। যেসব ক্রেতা চায়ের প্রতি অধিক আগ্রহ দেখাত, কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী চা-ওয়ালারা তাদের কিছু শুকনো চায়ের পাতাও দিত।

সেইসাথে চা উৎপাদনকারী ব্রিটিশ কোম্পানি ঢাকার কয়েকটি স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে শিক্ষার্থীদের বিনা পরিশ্রমে চা দেয়া শুরু করল। এই কার্যক্রম চলল টানা একবছর। তারপর বিনামূল্যে চা বিতরণ বন্ধ হলো। কিন্তু ইতোমধ্যেই ঢাকাবাসী চায়ে আসক্ত হয়ে গেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠেছে চায়ের আজীবন ভোক্তা! কোম্পানি তখন পাড়ার মুদি দোকানে চা-পাতা সরবরাহ শুরু করল। কিনে খাও।

একপর্যায়ে অনেক মানুষ যখন চা পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল তখন মহল্লার দোকান থেকে নামী রেস্টুরেন্ট-সর্বত্র চা পরিবেশন চালু হয়ে গেল। অচিরেই ব্যাঙের ছাতার মতো ছোট ছোট চায়ের দোকানে ছেয়ে গেল ঢাকা শহর। দুর্বীর গতিতে চলল চায়ের জয়যাত্রা। কিন্তু চায়ের সাথে দুধের মিশেল মোটেও স্বাভাবিক নয়। বরং আপনার পাকস্থলী বেচারার জন্যে অতি অস্বাভাবিক।

চা : একটি স্বাস্থ্যকর পানীয়

চায়ের মধ্যে রয়েছে প্রচুর এন্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও অন্যান্য যৌগ, যা ক্যান্সার হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করে; স্থূলতা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে এবং মস্তিষ্কে সতেজ চনমনে করে।

২০০৭ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ১৬ জন নারীর ওপর গবেষণা পরিচালনা

করেন। তাদেরকে রং-চা, দুধ-চা ও গরম পানি পান করতে দেন গবেষকরা। এরপর রক্তনালীর ওপর পানীয়গুলোর প্রভাব মাপা হলো। দেখা গেল, গরম পানির তুলনায় রং-চা রক্তনালীর প্রসারণ ঘটাতে অধিক কার্যকরী। কারণ চা-তে থাকে ক্যাটেচিন নামক এন্টি-অক্সিডেন্ট। হৃৎসুরক্ষায় যা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে যদি চায়ের সাথে দুধ মেশানো হয়, দুধের মধ্যে থাকা কেরাজিন নামক প্রোটিন নষ্ট করে দেয় ক্যাটেচিনের উপকারী প্রভাব।

ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে গবেষকরা জানান, ব্রিটিশরা পৃথিবীর শীর্ষ চা পানকারী জাতিগুলোর একটি। তবু তাদের হৃদরোগ প্রতিরোধে চা কোনো অবদান রাখছে না। কারণ প্রায় ৯৮ শতাংশ ব্রিটিশ দুধ-চা পানে অভ্যস্ত। গবেষক দলের প্রধান ও কার্ডিওলজির অধ্যাপক ভেরেনা স্ট্যাঙ্গল বলেন, দুধ মেশালে চায়ের টিউমার-প্রতিরোধী উপাদানের কার্যকারিতাও ব্যাহত হয়।

২০১২ সালে আরেক দল গবেষক চায়ের সাথে ডেইরি দুধের পরিবর্তে সয়াদুধ মিশিয়ে পরীক্ষাটি চালান। দেখা যায়, ফলাফলে কোনো হেরফের নেই। চায়ের সাথে যে-ধরনের দুধই মেশানো হোক না কেন, চায়ের গুণাগুণ বিনষ্ট হবেই।



চায়ে দুধ না হয় না মেশালেন। একটু চিনি মেশালে কি ক্ষতি হবে? হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর অধ্যাপক কী সান বলেন, গ্লিন টি পানের উপকারিতা পুরোপুরি নস্যাত করে দেয় চিনি।

এসব গবেষণালব্ধ তথ্য দৈনিক সংবাদপত্র, অনলাইন হেলথ ব্লগ, স্বাস্থ্যবিষয়ক টিভি প্রোগ্রামে আজকাল হরদম প্রচার করা হচ্ছে। আর কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা দুধ-চা পানের অপকারিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সেই ১৯৯৫ সাল থেকে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে সঠিক খাদ্যাভ্যাস-বিষয়ক আলোচনায় গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বলেন, দুধ ও চা-দুটাই উপকারী পানীয়। কিন্তু এ দুটোকে একসাথে মেশালে এমন একটি যৌগ উৎপন্ন হয় যা পাকস্থলী হজম করতে পারে না। ফলে কেউ পর পর ৮-১০ কাপ দুধ-চা খেলে তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হবেন। আর রং-চা পান করলে এনার্জি লেভেল বেড়ে যাবে। রং-চায়ের চেয়েও উপকারী হলো গ্লিন টি।

কোয়ান্টাম সদস্যরা তাই নিজেরা যেমন দুধ-চা পরিহার করেছেন, পরিচিতদেরও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলেছেন। ২৫ বছরের এই নীরব প্রচেষ্টার প্রতিফলন এখন জনজীবনে দৃশ্যমান।



অন্যদিকে ডায়াবেটিস প্রতিরোধে চা কোনো ভূমিকা রাখে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার। তারা দেখেন, চায়ের প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে তুলনামূলক ১৫ গুণ বেশি ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। কিন্তু চায়ে দুধ মেশালে ঘটে উল্টোটা, ইনসুলিন নিঃসরণের হার কমতে থাকে। চায়ে যদি ৫০ গ্রাম দুধ মেশানো হয়, তাহলে ইনসুলিনের নিঃসরণ শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাও মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তাই নিয়মিত দুধ-চা পান করার অভ্যাস ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার মোক্ষম উপায়।

সাম্প্রতিককালে একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, গ্লিন টি শরীরের মেটাবলিজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিখ্ট ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের গবেষক রিক হার্সেল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালিয়ে জানিয়েছেন, চায়ের কাপে যখন দুধ ঢালা হয়, মেটাবলিজম প্রক্রিয়ার ওপর গ্লিন টির ইতিবাচক প্রভাব উদ্ভাও হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ক্রমেই বড় হচ্ছে গ্লিন টি বাজার

স্বাস্থ্যসচেতন মানুষদের অনেকেই সকালটা শুরু করেন দুধ-চিনিহীন চা দিয়ে। যারা আরো সচেতন তারা বেছে নিচ্ছেন গ্লিন টি। চা পানের অভ্যাসে এই পরিবর্তন এসেছে কয়েক বছরের মধ্যে। সাধারণ চায়ের চাহিদা যেখানে বাড়ছে ৫ শতাংশ হারে, গ্লিন টির চাহিদা বাড়ছে ১৫ শতাংশ হারে। পাঁচ বছর আগেও বাংলাদেশে গ্লিন টি উৎপাদন করত মাত্র দুটি কোম্পানি। চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, এখন ছয়টি কোম্পানি সবুজ চা বাজারজাত করছে।

বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩,১৭০ কেজি গ্লিন টি আমদানি করা হয়েছিল। গত অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ২৩,৫১০ কেজি! এ দেশের মানুষ দুধ-চায়ের বিষাক্ত প্রভাব অচিরেই কাটিয়ে উঠতে পারবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র : হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৪
দ্য গার্ডিয়ান, ৯ জানুয়ারি ২০০৭
নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২
দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০১৯
বণিক বার্তা, ১৫ মে ২০১৪

নিয়মিত দান আনে কল্যাণ অফুরান

...(হে মানুষ!) যে অর্থবিশ্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না। (আল কোরআন, ২:২৭২)

দানের পুরস্কার বা প্রতিদান দাতাকে অবশ্যই দেয়া হবে—এটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই অঙ্গীকার। আর কেবল পরলোকে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও একজন দাতা নানাভাবে অনুভব করেন দানের বহুমুখী বরকত ও কল্যাণ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে নিয়মিত দান করেন যারা, তাদেরই কয়েকজনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো—

তিনটি আত্মিক শিশুর দায়িত্ব নিয়েছি

মেজর (অব.) এ কে এম আসাদুল হক



২০১৫ সাল থেকে আমি এতিমান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিশুদের শিক্ষা ও ক্রীড়ায় দেশসেরা সাফল্যের কথা যতবারই শুনি, আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

২০১৮ সালে গুরুজী একটি প্রোগ্রামে বললেন, দানের চেয়ে দায়িত্ব অনেক বড়। সেদিন সিদ্ধান্ত নিই— আমি একটি শিশুর পুরো দায়িত্ব নেব। কিছু দ্বিধা থাকলেও আমি সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। পরদিনই জানতে পারলাম, আমার বেতন ১০% বেড়ে গেছে! সাথে সাথে শ্রুতির নিকট শুকরিয়া আদায় করলাম। মাস শেষে হিসাব করে দেখলাম, তিনটি শিশুর দায়িত্ব আমি নিতে পারছি।

একপর্যায়ে আমার অফিসে কিছু জটিলতা শুরু হলো। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু শ্রুতির প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি আরো ভালো একটি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পেলাম। এখন আমি বেতনও পাচ্ছি দ্বিগুণ। দান আমার জীবনের সাথে সম্পূর্ণ জড়িয়ে গেছে।

[হেড অব ম্যানড সিকিউরিটি সার্ভিসেস, গার্দা শিল্ড, ঢাকা]

বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত থাকছি দানের বরকতে

নুরজাহান বেগম



২০১৭ সালের ঘটনা। অফিস শেষে বাড়ি ফেরার সময় হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। আমার সঙ্গে সেদিন ছাতা ছিল না বলে অফিসের নিচেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। অফিস বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায় নির্মাণ কাজ চলছিল। বৃষ্টির জন্যে

কোনো রিকশা পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো, একটু সামনে এগিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালে রিকশা পাব। কয়েক পা এগিয়ে আমি রাস্তার ধারে দাঁড়লাম।

তখনই আমার অফিস বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে বেশ কয়েকটি ইট নিচে পড়ল, ঠিক যে জায়গায় আমি একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। আল্লাহ তায়ালাই অশেষ করুণা, এভাবেই তিনি বালা-মুসিবত ও দুর্ঘটনা থেকে আমাকে ও আমার পরিবারকে রক্ষা করে চলেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। সৃষ্টির সেবায় মাটির ব্যাংক বিতরণ করতে আমার ভালো লাগে। হাতে টাকা এলেই তার একটি অংশ আমি দানের জন্যে আলাদা করে রাখি। তারপর বাকি অংশ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করি। আমার জীবনে দানের উপকারিতা ও সাফল্য অনেক।

[চাকরিজীবী]

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়েছে

ডা. মো. হুমায়ুন কবির

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মাটির ব্যাংকে দান প্রসঙ্গে গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি উদ্বুদ্ধ হই। দান করার সময় আমি আল্লাহর কাছে প্রবৃদ্ধি চাইতাম যেন আরো দান করতে পারি। সত্যিই আমি প্রতিনিয়ত দানের পরিমাণ বাড়তে পেরেছি। এ-ছাড়া সংসঙ্গে থাকার ফলে আমার পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। মানসিক অস্থিরতা থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি।

সন্তানের সার্বিক কল্যাণের নিয়তে আমার সহধর্মিণী একটি আত্মিক শিশুর আংশিক দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের সন্তান এখন আগের চেয়ে অনেক প্রশান্ত ও মনোযোগী। আমাদের পরিবারে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ বেড়েছে।

[মেডিকেল অফিসার, এস কিউ সেলসিয়াস লি., গাজীপুর]



নিয়মিত দান আমার জীবন বদলে দিয়েছে

মো. ওয়াহিদুজ্জামান

২০১৩ সালে এক বন্ধু আমাকে কোয়ান্টামের একটি মাটির ব্যাংক দেয়। নিয়মিত দানের ফলে আমার জীবনে বেশ পরিবর্তন এসেছে। আমি ঋণ জর্জরিত ছিলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে ঋণের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।

কোর্স করার পর ঋণমুক্তির নিয়তে আমি নিয়মিত দান করতে শুরু করলাম। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমি ঋণের সব টাকা শোধ করে দিলাম। দান করে দিন শুরু করা এখন আমার পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ। এর ফলে আমার পরিবারে আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছে। আমি মনে করি, যেদিন থেকে দান শুরু করেছি আমার জীবন বদলের সূচনা সেদিন থেকেই।

[প্রভাষক, বর্ণমালা আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]



সপরিবারে ট্যুরিস্ট ভিসা পেয়েছি

মনি সাহা



আমার এক বোন আমেরিকায় থাকে। অনেকদিন ধরেই আমরা আমেরিকায় বেড়াতে যেতে চাচ্ছিলাম। পরিচিত সবাই বলত, আমেরিকার ভিসা পাওয়াটা বেশ কঠিন।

এ বছর আমরা

পুরো পরিবার ট্যুরিস্ট ভিসার জন্যে আবেদন করি। ইন্টারভিউয়ের দিন ভিসা কর্মকর্তারা আমাদের তেমন কোনো প্রশ্নই করেন নি এবং সেদিনই আমাদের চার জনের ভিসা হয়ে যায়।

সবসময় আমি ঘর থেকে বের হওয়ার আগে মাটির ব্যাংকে দান করি। আমার বিশ্বাস, এত সহজে আমাদের ভিসা হয়ে যাওয়াটা এই দানেরই সুফল। বিপদ-আপদে আমি মাটির ব্যাংকে দানের উপকার পেয়েছি বহুবার।

[গৃহিণী]

হারিয়ে যাওয়া কাগজপত্র ফেরত পেলাম

আশরাফুন নাহার



গত বছর ঢাকায় বেড়াতে এসে আমার ব্যাগ চুরি হয়। ব্যাগে আমার জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অফিসের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ ছিল। এরপর আমি মাটির ব্যাংকে সাধ্যমতো দান করি যেন হারিয়ে যাওয়া

কাগজগুলো আমি ফিরে পাই।

সেদিন রাতেই এক ব্যক্তি আমাকে ফোন করে জানান যে, তিনি একটি ব্যাগ পেয়েছেন যাতে আমার আইডি কার্ড ও ফোন নম্বর খুঁজে পেয়েছেন। পরের দিন তিনি বাসায় এসে ব্যাগটি ফেরত দিয়ে যান। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম এবং আরেকবার আমি উপলব্ধি করলাম দানের গুরুত্ব।

[চাইল্ড ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল]

এতিমের দায়িত্ব নিয়ে আমার প্রশান্তি বেড়েছে

ইসরাত জাহান কাকলী



২০১৮ সালে আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ল। একথা শুনে পরিবারের সদস্যরা বিচলিত হয়ে পড়ল। বাবার চিকিৎসা শুরু হলো। উন্নত

চিকিৎসার জন্যে আমি তাকে নিয়ে বিদেশে যেতে চাইলাম। আমার মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। একসময় ভাবলাম, আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। তাহলে আমার টেনশন হচ্ছে কেন?

এরপর একদিন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শাহবাগ কার্যালয়ে গিয়ে জানতে পারলাম-কয়েকজন মিলে একটি অসহায় শিশুর দায়িত্ব নেয়া যাবে। আমারও ইচ্ছা ছিল, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একটি শিশুর দায়িত্ব নেব। কিন্তু প্রতি মাসে আট হাজার টাকা দেয়াটা আমার জন্যে কঠিন ছিল। কিন্তু এবার আংশিকভাবে দায়িত্ব নিতে পারলাম।

এদিকে বাবাকে বিদেশে নেয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ কিছু টেস্ট করাতে হলো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি-যেদিন আমি একজন এতিমের দায়িত্ব নিলাম, সেদিনই শুনলাম, বাবার ক্যান্সার হয় নি। অর্থাৎ পূর্বের রিপোর্টগুলো ভুল ছিল। গভীর শুকরিয়ায় মন ভরে গেল। এতিমের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আমার প্রশান্তি আরো বেড়ে গেছে।

[সহকারী অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

দান ও মেডিটেশন চর্চা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে

ডা. জিনাত হাবিবা



আমি আগে প্রায়ই সর্দি-কাশিতে ভুগতাম। মাসে ১০-১৫ দিনই আমার এই সমস্যা থাকত। ২০১২ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমি নিয়মিত মেডিটেশন ও দান করতে উদ্বুদ্ধ হই। এরপর ধীরে ধীরে

আমার এ সমস্যাতা দূর হয়ে যায়।

সুস্থতার পাশাপাশি দানের কল্যাণে আমি পেয়েছি মানসিক প্রশান্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্তি। তাই কোনো কাজ যতই কঠিন হোক, আমার কাছে সেটা খুব সহজ হয়ে যায়। যেমন, ডাক্তারদের জন্যে এফসিপিএস একটি কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু আমি ভাইভাসহ এ পরীক্ষার সবগুলো পর্বে প্রশান্তচিত্তে অংশ নিয়েছি এবং পাশ করেছি। কোনো পরীক্ষাভীতি আমার মধ্যে কাজ করে নি। নিয়মিত দান ও মেডিটেশন চর্চা বাড়িয়ে দিয়েছে আমার আত্মবিশ্বাস।

[ত্রিগোণ বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা]

প্রতিটি ধর্মেই দানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে

খগেন্দ্র নাথ সরকার



স্পন্ডিলিটি টিসের সমস্যার কারণে আমার বাম হাত প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। একগ্লাস পানিও তুলতে পারতাম না। নিজেকে সবসময় একজন রোগী মনে হতো। ২০১২ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই এবং

মেডিটেশন ও দানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করি। তখন থেকেই আমার জীবনে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মেডিটেশনের পাশাপাশি সুস্থতার নিয়তে মাটির ব্যাংকে আমি দান করতে শুরু করি। প্রভুর কৃপায় কিছুদিনের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। তখন থেকেই আমি মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করছি।

২০১৮ সালে আমি একজন এতিমের আংশিক দায়িত্ব নিয়েছি। তারপর থেকে আমার উপার্জনও বেড়ে গেছে। আসলে দান করলে যে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়, তার সাথে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। তাই প্রতি মাসেই আমি এতিমান কার্যক্রমে অঙ্গ হলেও দান বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

আর প্রতিটি ধর্মেই খুব স্পষ্টভাবে দানের কথা বলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমার আত্মিক উন্নয়ন ও মানসিক প্রশান্তির উৎস সৎদান।

[ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

কল্যাণকর চাওয়া পূরণের সহায়ক শক্তি হলো দান

ফারজানা আহমেদ



২০১৭ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর থেকেই নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। পারিবারিক জীবনে বেশ কিছু সমস্যা ছিল আমার। যার জন্যে আমার মধ্যে হতাশা কাজ করত। প্রতিদিন সকালে নাশতা

করার আগে পারিবারিক প্রশান্তির জন্যে মাটির ব্যাংকে দান করতে থাকি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ধীরে ধীরে আমার পরিবারে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। আমরা সবাই এখন অনেক ভালো আছি।

যশোরে আমার একটি বড় ফ্ল্যাট বুকিং দেয়া ছিল। কিন্তু কোম্পানি এর পরিবর্তে ১১৩২ বর্গফুটের ছোট একটি ফ্ল্যাট দেয়। এটা নিয়ে আমার বেশ মন খারাপ হয়। এবছর সেই বিল্ডিংয়ের ডিজাইন নিয়ে তদন্ত হয়। কোম্পানিকে পুরো বিল্ডিংয়ের ডিজাইন পরিবর্তন করতে হয়। ফলে একটি ইউনিটের কয়েকটি ফ্ল্যাটের আয়তন বাড়তে হয়। সেই ইউনিটের আওতায় আমার ফ্ল্যাটটিও আছে। আমার বিশ্বাস, সকল কল্যাণকর ইচ্ছা পূরণে দানই সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

[গৃহিণী]

নিয়মিত দানের ফলে টেনশন দূর হয়েছে

মো. আলামিন



আমি একটি বহুজাতিক কোম্পানির বিক্রয় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছি। কোনো কাজ করতে গেলে আগে টেনশনে থাকতাম-এই বুঝি কোনো ভুল হয়ে গেল! আমি এই টেনশন অফিস থেকে বাসায় বয়ে নিয়ে যেতাম।

বাসায় গিয়েও টেনশন হতো, কোনো কাজ ভুল করলাম না তা!

২০১৬ সালে যখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলাম তখন মাথা ঠান্ডা রাখতে শিখলাম। আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। এরপর নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দানের মাধ্যমে দূর হতে থাকল কাজের টেনশন। এখন কাজে ভুলের পরিমাণ কমে গেছে এবং কাজ করতে গিয়ে কোনো টেনশন হয় না। সারাদিন হাসিখুশি থাকতে পারি। নিয়মিত দানের ফলে লাভ করেছে সুস্থতা। আমার সহকর্মীরা যেখানে অসুস্থ হয়ে প্রায়ই ছুটি নিচ্ছে, আমি সেখানে অসুস্থতার জন্যে আজ পর্যন্ত কোনো ছুটি নিই নি।

মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করে বড় যে উপকার পেয়েছি তা হলো, বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি। আমি জানি, দান অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। যখন মাটির ব্যাংকে দান করি তখন এই অনুভূতি নিয়ে দান করি যে, আমার সকল বালা-মুসিবত দূর হচ্ছে।

[সিনিয়র ট্রেনিং এক্সিকিউটিভ, মেটলাইফ, যশোর]

দান এবং দায়িত্বের বরকত এসেছে পরিবারে

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান



২০১৩ সালে একটি আলাচনায় শুনেছিলাম-একজন শিশুর দায়িত্ব নেয়ার কথা। আমার মেয়ের ভালো পড়াশোনার নিয়তে আমি আংশিকভাবে একটি শিশুর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সময়মতো

প্রতিটি পড়া শেষ করতে তার কষ্ট হতো। এ নিয়ে সে স্ট্রেসে ভুগত। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার মেয়ে এখন বুয়েটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

পরবর্তী বছরগুলোতে এ দানের পরিমাণ বাড়ানোর পথ আল্লাহ আমার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ২০১৮ সালে আমি এককভাবে আমার একটি শিশুর দায়িত্ব নিতে পেরেছি।

২০১৬ সালে মাটির ব্যাংক করসেবা চলছিল। আমি চাকরির নিয়তে সেই করসেবায় অংশ নিই। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ভালো একটি চাকরি পাই। দানের বরকত আমার পরিবারে সবসময় বিরাজমান।

[প্রোগ্রাম অফিসার, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, কান্ট্রি অফিস ফর বাংলাদেশ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমরা যারা ধ্যানের পরিবেশে মাঝে মাঝে কয়েকদিন থাকতে চাই, তাদের জন্যে একটা কোয়ান্টাম হোম করা যায় না? ঢাকা শহরে এরকম ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

উত্তর : মাঝে মাঝে কয়েকদিন ধ্যানের পরিবেশে থাকতে চাই-এই চিন্তাটাই হচ্ছে একটা অন্তঃসারশূন্য চিন্তা অর্থাৎ যে চিন্তার মধ্যে বাস্তবতার চিহ্ন নেই। আপনি যদি কোয়ান্টামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাকে ধারণ করতে পারেন, যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থানে আপনি ধ্যানের পরিবেশে থাকতে পারবেন। জনারণ্যেও আপনি একা থাকতে পারবেন, কোনো কিছু আপনাকে স্পর্শ করবে না।

আপনি ভাবছেন, নিরিবিলি পরিমণ্ডলে থাকলে আপনি সুখী হবেন। কিন্তু সুখ তো অন্তরের ব্যাপার। যে-কোনো পরিবেশেই আপনি প্রশান্তিতে থাকতে পারেন, ধ্যানের স্তরে থাকতে পারেন। এর জন্যে দরকার আপনার ইচ্ছা ও মানসিক সুস্থিরতা।

বহু বছর আগে আমি একজন লেখককে দেখেছি- তিনি লিখছেন, এক সন্তান তার ঘাড়ের ওপরে চড়ে বসে আছে এবং চুল ধরে টানছে। আরেকজন তার পাশে দৌড়াইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তিনি লিখে চলেছেন। কেন পরেছেন? কারণ তিনি লেখার মধ্যেই এত মগ্ন ও ধ্যানস্থ যে, কে ঘাড়ের ওপর বসে থাকল, কে চুল ধরে টানল, এসব কিছুই তাকে স্পর্শ করে না।

কিন্তু আমরা সেই স্তরে থাকতে পারি না। একটু এদিক থেকে সেদিক হলেই আমরা প্রভাবিত হয়ে যাই, বিরক্ত হয়ে পড়ি। বিরক্তি আসাটা স্বাভাবিক কিন্তু সেটা জয় করতে পারাই হচ্ছে ধ্যান। আর সেই স্তরে যাওয়ার জন্যে ক্রমাগত অনুশীলন প্রয়োজন।

আসলে ভেতর থেকে প্রশান্ত হতে না পারলে বাইরের কোনো পরিবেশ আপনাকে প্রশান্ত রাখতে পারবে না। সুন্দর পরিবেশে যাবেন, যতক্ষণ সেখানে থাকবেন ক্ষণিকের জন্যে আপনি প্রশান্তি পেলেন, কিন্তু যেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, আবার দেখা যাবে অশান্ত হয়ে উঠবেন।

কোয়ান্টামের প্রোথামণ্ডলোতে আমাদের হাজারো সদস্য সমবেত হন। অডিটোরিয়ামের বাইরে কখনো কখনো অনেক ধরনের শব্দ আর হে-হল্লা শোনা যায়। আমরা তো সেই কোলাহলের মধ্যেই মেডিটেশন করি। আমরা যখন ধ্যানের স্তরে চলে যাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব আমাদের স্পর্শ করে না। অতএব আপনাকে সবসময় জানতে হবে, কীভাবে চারপাশের সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও আপনি আপনার প্রশান্তি অটুট রাখতে পারেন।

একটা কথা আছে, কাক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে কিন্তু ওটা যেন মাথায় বাসা না বাঁধে। ঠিক তেমনি জীবনে দুশ্চিন্তা আসবে, দুর্ভাবনা আসবে, বিরক্তি আসবে কিন্তু সেটা যেন আপনার প্রশান্তি নষ্টের কারণ না হয়।

রাগ আসবে, ঈর্ষা আসবে, কখনো আরেকজনকে দেখলে মনে হতে পারে-আমারও যদি এরকম হতো! যেমন : কারো সুন্দর চুল দেখে একটু ঈর্ষা আসতেই পারে কিন্তু সেই ঈর্ষাটা যেন মনে বাসা না বাঁধে। যখনই মনে হলো যে, তার চুলটা খুব সুন্দর, সাথে সাথে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন যে, আল্লাহ তুমি তাকে সুন্দর চুল দিয়েছ, এই চুলটা যেন এমনই

সুন্দর থাকে। অর্থাৎ ঈর্ষা আসার সাথে সাথে যখন আপনি দোয়া করলেন তখন আপনার পাপটা পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। দৃষ্টিভঙ্গিটা হতে হবে এরকম। সবসময় অন্যের ভালো দেখে আনন্দিত হবেন। তাহলে আপনার জীবনেও বরকত আসবে।

জীবনে ভালো থাকার এসব সূত্র যদি একবার বুঝতে পারেন, কোনো দুশ্চিন্তাই আপনার প্রশান্তি নষ্টের কারণ হবে না। এটা তখনই সম্ভব, যখন আপনি অন্তরে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন। বাইরের নেতিবাচকতা তখন আপনাকে প্রভাবিত করবে না।

প্রশ্ন : আমি চিত্রকলায় আগ্রহী। আমি কি চিত্রশিল্পী এম এফ হুসেন স্যারকে আমার জীবনের মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? দয়া করে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন।

উত্তর : এম এফ হুসেনের (মকবুল ফিদা হুসেন) চিত্রকলায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তিনি জীবন শুরু করেছিলেন সিনেমার হোর্ডিং অর্থাৎ সিনেমা হলের বাইরে যে বিশাল বিশাল পোস্টার, সেই হোর্ডিং পেইন্টারের সহযোগী হিসেবে। ওস্তাদকে রং এগিয়ে দিতেন, এই ছিল তার কাজ। তুলি ধরার অনুমতি পেতেই লেগে যায় তিন-চার বছর। সেখান থেকে একজন মানুষ এত বড় শিল্পী হয়েছেন। অর্থাৎ তার কাজটাকে কত ভালবেসেছেন তিনি!

সাধারণভাবে আমরা যখন কাউকে মডেল করতে চাই তখন তার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ আর বাহ্যিক অবয়বটাকেই মডেল বানিয়ে ফেলি। আসলে মডেল কিন্তু ব্যক্তির চেহারা বা পোশাক নয়। যেমন, সাধারণ মানুষ সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের মতো সাজে। চুল কাটে, গৌফ রাখে। কিন্তু মডেল মানে কি তাই?

মডেল হলো একজন মানুষের কাজ, তার আদর্শ। যা তাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে, আজ আপনি তাকে জীবনের মডেল করতে চাইছেন।

যেমন, পাবলো পিকাসো। তিনি একবার এক ফার্নিচারের দোকানে গেলেন। একটা কাগজে তার কাঙ্ক্ষিত ফার্নিচারের ডিজাইন একে দিয়ে দোকানিকে বললেন, এটা তৈরি করে দিতে হবে। কত দাম পড়বে? দোকানের মালিক পিকাসোকে চিনত। পিকাসোর খ্যাতি সম্পর্কে জানত। সে বলল, স্যার, আপনি যে কাগজে ডিজাইনটা একে দিয়েছেন, এখানে একটা সই করে দিন শুধু। দাম লাগবে না। ফার্নিচার আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে। পিকাসো সই করে দিলেন। দোকানদার কাগজটা বাঁধাই করে দোকানের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখল।

অর্থাৎ পিকাসোর সিগনেচারটাই হচ্ছে ফার্নিচারের দাম। একটা সই করলেন, পুরো ফার্নিচার ফ্রি হয়ে গেল। এটা কখন হয়? যখন একজন মানুষ পিকাসো হতে পারে। পিকাসোর একটা কথা ছিল-‘মুসলমানরা যে-রকম জুতা বাইরে রেখে মসজিদে ঢোকে, আমিও সে-রকম স্টুডিওতে ঢোকার সময় দেহটা বাইরে রেখে শুধু মনটা নিয়ে ঢুকি।’ অর্থাৎ তখন তার দেহ বলে কিছু নেই, শুধুই ছবি আঁকার চিন্তা। এজন্যেই তিনি পিকাসো।

তাই যখন কাউকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করবেন- তার কর্ম, গুণ ও আদর্শটাকে গ্রহণ করবেন, তার

পোশাক বা অবয়ব নয়। বেশিরভাগ মানুষই অনুসরণ না করে অনুকরণ করতে চায়। কিন্তু অনুকরণ তো বাদরের বিশেষত্ব।

যারা খ্যাতিমান হয়েছেন তারা তাদের কর্ম ও গুণের কারণেই তা হয়েছেন। গুণই মানুষকে সম্মানিত করে। কিন্তু গুণের দিকে নয়, অনেক সময় আমাদের নজর চলে যায় তাদের অপকর্মের দিকে। কারণ তাতে হয়তো নিজের অপকর্মটাও নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। নায়ক-নায়িকা কতগুলো প্রেম করল, কোথায় কী করল-মানুষ এসব খুঁজতে যায়। কিন্তু এটা বোঝে না-সে ১০টা প্রেম করলেও নায়ক-নায়িকা হতে পারবে না। তাই দেখতে হবে অভিনয়ের প্রতি তার মনোযোগ আর আত্মনিবেদন কতটুকু আছে।

অতএব যাকে আপনি জীবনের মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তার গুণগুলো আপনি দেখবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন এবং তা আত্মস্থ করবেন নিজের জীবনে। তার বাহ্যিক অবয়ব বা পোশাক-আশাক নয় এবং তার দোষটাও নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করলে আপনিও পারবেন আপনার মডেলের মতো সফল ও স্মরণীয় হতে।

প্রশ্ন : আমার অনেক ছোট ছোট চাওয়া আল্লাহ পূরণ করেন। কিন্তু বড় বড় প্রার্থনা তিনি কেন কবুল করেন না?

উত্তর : বড় প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্যে তো বড় সময় দিতে হবে। যেমন, আমরা এখন একেকটা প্রোগ্রাম করি কয়েক হাজার মানুষ নিয়ে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে যখন শুরু করেছিলাম, আমাদের প্রথম ওয়ার্কশপের উপস্থিতি ছিল মাত্র ১১ জন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু হয়েছিল ছোট্ট একটা রুম থেকে। ল্যাব্‌ফোন ছিল মাত্র একটা। এখন ফাউন্ডেশনের যে কতগুলো টেলিফোন তা হিসাব করে বলতে হবে।

এই বিস্তৃতির জন্যে তো আমাদের সময় দিতে হয়েছে। বড় চাওয়ার জন্যে বড় অপেক্ষা আর বড় ধৈর্য লাগে। ধৈর্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বড় চাওয়া আল্লাহ পূরণ করেন কিন্তু আপনাকে তো সেটা গ্রহণ করার মতো বড় হতে হবে। ১৯৯৩ সালে যদি এক হাজার মানুষ চলে আসত, সেটা সামাল দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন উপস্থিতি যত বেশিই হোক, সেটা ব্যবস্থাপনার শক্তি আমাদের সজ্ঞ অর্জন করেছে। আমাদের যত সামর্থ্য আর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, সবই আল্লাহ ক্রমান্বয়ে দিয়েছেন।

অতএব প্রস্তুতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন যোগ্য হবেন, আপনি অবশ্যই পাবেন এবং এর জন্যে আপনাকে ধৈর্যের সাথে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। আসলে আল্লাহ তায়ালা পরম দাতা। আমরা চাওয়ার মতো চাইলে অবশ্যই তিনি দেবেন। তবে পাওয়ার প্রস্তুতি অবশ্যই থাকতে হবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

একা বড় কিছু করা যায় না। আমি সৎসঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের সাংগঠনিক শক্তিকে বিকশিত করব।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আশীর্বাদ

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আদিব হাসান ও ডা. নাফিসা আক্তার। ৪ মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৮৭ তম পর্বে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন এই চিকিৎসক-দম্পতি। তাদের সাথে আলাপচারিতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ। শুরুতে তিনি এই চিকিৎসক-দম্পতির কাছে জানতে চান, জীবন কেমন?



উত্তরে দুজনই বলেন, জীবন খুব সুন্দর। এটি সৃষ্টিকর্তার একটি উপহার। এর প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে আশীর্বাদ। তাই আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা এবং যা আছে তা নিয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা। যা নেই তা নিয়ে যদি দৃষ্টিভঙ্গি করতে থাকি তাহলে আমরা হতাশায় নিমজ্জিত হবো। ইতিবাচক চিন্তাই জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে।

‘তোমরা বলছ, জীবন অনেক সুন্দর। কিন্তু জীবনে চলার পথে দুঃখ-দুর্দশা আর ভোগান্তিগুলোর প্রয়োজন কতটুকু?’

ডা. আদিব বলেন, জীবনে ভোগান্তির প্রয়োজন আছে তা আমি বলব না। তবে ভোগান্তি জীবনের অংশ। জীবন মানে সাজানো কোনো স্বপ্ন নয়, যেখানে সবকিছু নিজের মনমতো হবে। বরং জীবন একটি পরীক্ষা। আর পরীক্ষা সবসময় কঠিন হয়। জীবনের অংশ হিসেবে রোগ-শোক নানারকমের ঝামেলা ভোগান্তি থাকবে। এগুলো জয় করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে জীবনের একপর্যায়ে এসে থেমে যেতে হয়। তখন জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় না।

‘এ কথাগুলো কি নিজের বিশ্বাস থেকে বলেছ নাকি বই-পত্রের কথা?’ আদিবকে আবার প্রশ্ন করেন নিজামউদ্দিন আহমেদ।

কথাগুলো কিছুটা একাডেমিক মনে হতে পারে। তবে অন্তর থেকেই বলেছি—এভাবেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন ডা. আদিব। তিনি আরো বলেন, মানুষের জীবনে কখনো চরম কষ্টের সময় আসতে পারে। মনে হতে পারে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আর উপায় নেই। গত আট বছরে আমার অসুস্থতার জন্যে অনেকবার মনে হয়েছে, পরের দিনটা আর দেখতে চাই না। জীবন তখনই থেমে গেলে যেন খুশি হই। কিন্তু পরক্ষণেই আমি জীবনের অর্থকে নতুন করে উপলব্ধি করেছি। আবার আত্মবিশ্বাস পেয়েছি—ভোগান্তিকে জয় করে আমাদের সামনে এগোতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে ডা. আদিব আক্রান্ত হন জটিল এক রোগে। পা দুটো হয়ে পড়ে চলৎশক্তিহীন। হুইল চেয়ার হলো তার নিত্যসঙ্গী। সেইসাথে অসহনীয় ব্যথা। বিভিন্ন ওষুধেও যখন কাজ হচ্ছিল না, ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্যে চিকিৎসকরা তখন তার শরীরে ব্যথানাশক একটি পাম্প বসিয়ে দিলেন। জীবনের হঠাৎ এই ছন্দপতনে তিনি থেমে যান নি। চিকিৎসক স্ত্রী নাফিসা আক্তার ও পরিবারের উৎসাহে শুরু করেছেন নতুন করে পথচলা। সমস্ত সীমাবদ্ধতা জয় করে আদিব ও নাফিসা ইল্যাপ্তের রয়েল কলেজ থেকে এমআরসিপি সম্পন্ন করেছেন। এখন দুজনেই পুরোদস্তর কাজ করছেন চিকিৎসক হিসেবে, মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

অধ্যাপক নিজামউদ্দিন এ পর্যায়ে ডা. নাফিসাকে বললেন, সব মানুষের জীবনে তো নাফিসা নেই। তুমি যেভাবে আদিবের সাথে আছ, এমন অনুকূল পরিবেশ তো সবাই পায় না। কিন্তু তোমার অবস্থা কী? তোমার কখনো থেমে যেতে ইচ্ছে করে নি? মনে হয় নি যে, যথেষ্ট হয়েছে, আর পারা যাচ্ছে না!

ডা. নাফিসা বলেন, আমি এটা মানছি, আদিবের মতো সবাই এমন অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ পায় না। কিন্তু নিজের তাগিদ না থাকলে অন্যের চেষ্টায় কেউ

খুব বেশি দূর এগোতে পারে না। এখন হয়তো অনেকেই বলছেন, পরিবার সাথে ছিল তাই আদিব পেরেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি এমনটা না-ও হতো, আল্লাহর রহমতে সে যে-কোনো উপায়ে এগিয়ে যেত।

এভাবে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানটি। অধ্যাপক নিজামউদ্দিন প্রসঙ্গ পাণ্টে ডা. আদিবের কাছে জানতে চাইলেন যে, রাষ্ট্র বা সমাজ রোগীদের ভোগান্তি কমাতে কী ভূমিকা রাখতে পারে?

আদিব জানান, আমার এ রোগের সূত্রপাত

চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে। কোনো এক রোগীর কাছ থেকেই আমি এ রোগে সংক্রমিত হয়েছি। তার মানে, চিকিৎসা পেশায় যারা জড়িত তাদের সবসময়ই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত একজন রোগীর দায়িত্ব নেয়ার ধারণাটি আমাদের দেশে এখনো গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি সচেতন হয় এবং এগিয়ে আসে তাহলে সমষ্টিগতভাবে এই সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। এজন্যে প্রয়োজন সবার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

একই প্রসঙ্গে ডা. নাফিসা বলেন, সমাজে আমরা যারা সুস্থ আছি, তাদের সহযোগিতা ও সমানুভূতিশীল আচরণ অসুস্থদের জীবনকে আরো সহজ করতে পারে। যেমন, আমরা রাস্তা বানানোর সময় এমন ব্যবস্থা রাখতে পারি, যাতে হুইল চেয়ারেও একজন সহজে রাস্তা পার হতে পারেন। বাড়ি বানানোর সময় খেয়াল রাখতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তিও যেন নিজেই হুইল চেয়ারের সাহায্যে টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। রেস্টুরেন্টগুলোতে এমন ব্যবস্থা রাখতে পারি যেন হুইল চেয়ারের একজন স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারেন।

অধ্যাপক নিজামউদ্দিন চিকিৎসক-দম্পতির কাছে এবার জানতে চান, ‘তোমরা তো অনেক ভোগান্তি সহ্য করেছ এবং এখনো করছ। কী মনে হয় তোমাদের—পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা বেশি নাকি ভালবাসা বেশি?’

‘পৃথিবীতে অবশ্যই ভালবাসা বেশি। নিষ্ঠুরতা বেশি হলে আমাদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেত।’—একই আশাবাদ ব্যক্ত করেন দুজন।

মুক্ত আলোচনার এ পর্বে আরো উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কেরালায় কমিউনিটি বেইজড প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রবর্তক ও ইনস্টিটিউট অব প্যালিয়েটিভ মেডিসিনের প্রাক্তন পরিচালক ডা. সুরেন্দ্র কুমার। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, দুর্দশা বা ভোগান্তির সময় হয় একজন মানুষের ভেতরের সবচেয়ে খারাপ প্রবৃত্তিগুলোর প্রকাশ ঘটে, নয়তো সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ তার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। নিরাময়-অযোগ্য বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষকে প্রশমন সেবা দিতে গিয়ে প্রতিদিন আমি এই ঘটনাগুলোই দেখি। তাই আমি মনে করি, দুর্দশাকে জয় করাই হলো জাগতিক ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করা। আর এখানেই রয়েছে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সবশেষে সঞ্চালক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ বলেন, মানুষের মন ও আত্মার শক্তিটা বিশাল। দুর্দশা বা ভোগান্তি এই শক্তিকে আরো বড় করে তুলতে পারে। আমরা এই মনের সঠিক চর্চা করলাম কিনা, অন্যকে ভালবাসলাম নাকি ঘৃণা করলাম, তার ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক ভালো থাকা। এটাই মানবিকতা।

আর এই মানবিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে ডা. নাফিসা এবং ডা. আদিব। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। এখানে সবার মুখোমুখি দাঁড়ানোর যে সাহস তারা দেখিয়েছে তা খুব কম মানুষই পারে। এটাই হলো হীনম্মন্যতাকে জয় করে সত্যের মুখোমুখি হওয়া। আর জীবনের এই গল্পগুলো আমাদের সবসময় অনুপ্রেরণা দেয় এবং পুনরায় বিশ্বাস করায় যে, আমিও পারব। যেমনটা ওরা পেরেছে।

মহাজাগতিক সফরে দেলোয়ার হোসেন



কোয়ান্টাম পরিবারের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন খুলনা শাখার সাবেক মোমেন্টারিয়ার দেলোয়ার হোসেন মুকুল। ১ মে বুধবার ৬৩ বছর বয়সে তিনি মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেছেন (ইল্লালিল্লাহি ... রাজিউন)।

সপরিবারে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১০৯ তম ব্যাচে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশনের সাথে তার সম্পৃক্ততা শুরু। কোর্স করার পর থেকেই দেলোয়ার হোসেন সজ্ঞের কাজের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। ২০০০ সালে সহধর্মিণী রেজানুজ্জাহানের প্রেরণায় তার আবাসস্থল বাগমারায় খুলনা সেলের কার্যক্রম নতুন উদ্যমে শুরু হয়; যার পরিণত রূপ আজকের খুলনা শাখা।

তিনি কোয়ান্টাম চেতনাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং সেই আলোকে তার জীবনকে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। কাজে কোনোরকম অবহেলা বা ক্লান্তির সাথে কোনোদিন আপস করতে দেখা যায় নি তাকে। ফাউন্ডেশনের কাজে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা ও সবাইকে নিয়ে কাজ করার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তার। সজ্ঞের যে-কোনো প্রয়োজনে সবসময় তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

ব্যক্তিজীবনে মিশুক ও পরিপাটি মানুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সবক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। সংস্কৃতিমনা এ মানুষটি বেশ ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন।

একজন দানশীল এবং পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। ঈদের আগেরদিন কোনো অসহায় মানুষ তার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে এবং তিনি পরনের জামা খুলে দিয়েছেন— এমন ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার।

তার জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৯ মার্চ। বাবা মরহুম আমজাদ হোসেন, মা নুরজাহান বেগম। ১০ ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র ও অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন তিনি।

কোয়ান্টামমের আরোগ্যশালায় কসমোড্রোমে তাকে সমাহিত করা হয়। ফাউন্ডেশনে তার সামগ্রিক অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। পরম করুণাময় তার সকল সৎকর্ম কবুল করুন। তার মহাজাগতিক সফর প্রশান্তিময় হোক—স্রষ্টার কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ টানা তৃতীয়বার ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা

৪৭ তম (২০১৮) গ্রীষ্মকালীন ও ৪৮ তম (২০১৯) শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে ক্রীড়ায় টানা তৃতীয়বারের মতো দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। ৫ মে ঢাকার কাকরাইলস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা



মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মাননা গ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের দুজন মেয়ে কোয়ান্টা। শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী (সর্বভাষা), সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন (সর্ববামে)

বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক।

সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কোয়ান্টাম ইয়োগা



- ৩, ৪ মে বিয়াম ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৭৩ তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩৮ জন নারী ও ৪৪ জন পুরুষসহ ৮২ জন নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে ৪০ জন চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- ২০ ও ২৭ এপ্রিল আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চট্টগ্রামে অংশ নেন ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ১৪ জন নারী ও ৬৮ জন পুরুষ নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

- ২৬, ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লাতে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪৪ জন নারী ও ৬৬ জন পুরুষসহ মোট ১১০ জন নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
- ১২ ও ১৩ এপ্রিল বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২২ জন মহিলা এবং ৬৩ জন পুরুষসহ মোট ৮৫ জন নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা অংশ নেন।